আমার ডায়েরী থেকে : নাট্যাচার্যের সান্নিধ্যে

মুখবন্ধ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

ম ল য় র ক্ষি ত

২০১৪ সালটি শ্রীশম্ভু মিত্রের জন্মশতবর্ষের আলোকচ্ছটায় এতই উজ্জ্বল যে আমাদের যাবতীয় মনোযোগ, যাবতীয় চিন্তা ও মননের আকর্ষণ তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। মৃত্যুর পর সতেরো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সতেরো বছরের নীরবতা এবং তার চেয়ে দীর্ঘতর অবহেলা-অসম্মানকে সুদে-আসলে পুষিয়ে দিয়ে ভরিয়ে তোলার আয়োজনে আমরা মেতে উঠেছি। মেতে ওঠার এই আয়োজনে কত সহজেই না ভুলে বসে আছি বছরটা বিজন ভট্টাচার্যেরও শতবর্ষ। শম্ভু মিত্রের সঙ্গে যে-নামটি আমাদের একই পঙ্‌ক্তিতে উচ্চারণযোগ্য সেই বিজন ভট্টাচার্য—গোষ্ঠদা-কে আমরা কত সহজেই না ভুলে আছি। এমনকী ভুলে গেছি বছরটা শিশিরকুমার ভাদুড়ির জন্মের একশো পঁচিশতম বর্ষও বটে। এবং সেই শিশিরকুমার বিগত শতাব্দীতে জীবিত অবস্থাতেই যিনি কিংবদন্তী হয়ে উঠেছিলেন। শম্ভু মিত্র তাঁর 'যুদ্ধোত্তর যুগে বাংলা মঞ্চে সংকট' প্রবন্ধে শিশিরকুমার সম্পর্কে একটি মন্তব্য করেছিলেন, মন্তব্যটি ছিল—'রাতের পর রাত দেশের সমস্ত লোকের কল্পনাকে জ্বালিয়ে দিয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটা অসহ ঔজ্জ্বল্য নিয়ে এই নবযুগসূচক আবির্ভূত হয়েছিলেন মঞ্চে। কলেজের ছাত্রদের মনে হত রবীন্দ্রনাথ আর শিশিরকুমার, একই পঙ্‌ক্তির যেন দুটো নাম।'

প্রবন্ধটি শম্ভু মিত্র লিখেছিলেন ১৯৪৭-এ, তাঁর লেখা এটিই প্রথম প্রবন্ধ, তেমনটাই আমরা দেখেছি শাঁওলী মিত্র সম্পাদিত *শম্ভু মিত্র রচনা সমগ্র*-র প্রথম খণ্ডে। ততদিনে শিশিরকুমার তাঁর প্রতিভার প্রায় সবটুকুই নিঃশেষ করে ফেলেছেন। কিন্তু শম্ভু মিত্র তাঁকে যে অর্থে 'নবযুগসূচক' বলেছেন সেটা ছিল ঐতিহাসিকভাবেই সত্য। রবীন্দ্রনাথ একবার জানিয়েছিলেন তাঁকে কবিখ্যাতি পেতে, প্রতিষ্ঠা পেতে যতদিন ধরে যে-ভাবে পরিশ্রম করতে হয়েছে, শিশিরকুমারকে তা করতে হয়নি। আবির্ভাবের সময় থেকেই

মানুষটি খ্যাতির প্রায় চূড়ান্তে পৌঁছেছেন। সমসাময়িক বন্ধুগোষ্ঠী ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন ঐতিহাসিকভাবেই নবযুগের সূচনাকারী, শম্ভু মিত্রের ভাষায় 'রবীন্দ্রনাথ আর শিশিরকুমার, একই পঙ্‌ক্তির যেন দুটো নাম'। শিশিরকুমারের গুণমুগ্ধ তখন কেই-ই বা ছিলেন না! রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতথী, নরেশচন্দ্র মিত্র কে নন? পেশাদার রঙ্গমঞ্চে একেবারে আবির্ভাব লগ্নেই মানুষটি খ্যাতি ও যশের চূড়ান্তে পৌঁছেছিলেন। সেই মুগ্ধতার অসংখ্য পরিচয় সেকালের পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। শংকর ভট্টাচার্য তাঁর *নাট্যাচার্য শিশিরকুমার* গ্রন্থের শেষে 'গ্রন্থ-প্রস্তুতির উপকরণ'-এ সেই-সব লেখালিখির একটি তালিকা প্রস্তুত করে দিয়েছেন।

শিশিরকুমারকে ঘিরে এই মুগ্ধতা, এই উন্মাদনার কথাগুলি এত জোর দিয়ে বলছি তার কারণ, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'নাট্যচার্যের সান্নিধ্যে' শীর্ষক তাঁর ডায়রিগুলি পড়তে পড়তে ওই একই মুগ্ধতার পরিচয় পেয়েছি। অবশ্য শম্ভুবাবুদের সময়কালের মুগ্ধতাবোধ থেকে শমীকবাবুদের সময়কালের মুগ্ধতাবোধের মাত্রাগত তফাত নিশ্চয়ই আছে। তবে যেটা আমাকে আশ্চর্য করে, শম্ভুবাবু যখন তার মুগ্ধতাবোধের কথা লিখছেন সেটা শিশিরকুমারের আবির্ভাবের যুগের কথা আর শমীকের যে মুগ্ধতাবোধ সেটি শিশিরকুমারের জীবনের শেষ সময়ের সত্তরের আশেপাশের কয়েকটি বছরের কথা। মাঝখানে পেরিয়ে গেছে গোটা একটা যুগ। বিজন ভট্টাচার্য আর শম্ভু মিত্রের হাত ধরে পেশাদার থিয়েটারের সমান্তরাল শক্তিশালী একটি ধারা তৈরি হয়েছে। সমান্তরাল সেই ধারাই আবার শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে নবনাট্য আন্দোলনের রূপ নিয়েছে পঞ্চাশের দশক থেকে। যাকে আমরা আধুনিক নাট্য-আন্দোলন বলি সেই আধুনিকতা বাংলা থিয়েটারে তখন প্রায় দাপিয়ে রাজ করছে। আর অস্তমিত মধ্যাহ্নের প্রহর পেরোনো শিশিরকুমার শ্রীরঙ্গমে প্রায় 'থিয়েটার থিয়েটার খেলা'য় মগ্ন আছেন। আশ্চর্য এই মানুষটিকে ঘিরে সেই মুগ্ধতাবোধ এবং বিস্ময়ের তখনও শেষ নেই। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়রি, তরুণ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ সেই কারণেই এক ঐতিহাসিক সময়ের স্পন্দনকে ধরে রাখে।

শিশিরকুমারের মতো যুগন্ধর প্রতিভা যখন বাংলা থিয়েটারে আবির্ভূত হন, তরুণ প্রজন্ম—কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল তো বটেই, আপামর শিক্ষিত বাঙালিই ওই প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। শম্ভু মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সেই আকর্ষণেই শিশিরকুমারের নাট্যদলে অভিনয়ে ঢুকেছিলেন। সময়টা ত্রিশের দশকের

শেষ ও চল্লিশের শুরু। পরবর্তী সময়ে যখন গণনাট্যের ধারা তৈরি হয়েছে, তারও পরে গণনাট্য ছেড়ে শম্ভু মিত্র বহুরূপী গঠন করেছেন, সেই বহুরূপীকে সামনে রেখেই নবনাট্য আন্দোলন একটু একটু করে জমি তৈরি করছে। দর্শকদের ওই শিশিরকুমারের মোহমুগ্ধ রোমান্টিসিজম থেকে সরিয়ে এনে আধুনিকতার দিকে চোখ ফেরানোর প্রবল চেষ্টা চলছে। এই পর্বেই শম্ভু মিত্রের বেশ কিছু লেখায় শিশিরকুমারকে তীব্র তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ ও তাঁকে প্রায় অস্বীকার করবার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। অত্যন্ত প্রয়োজনবোধে দুটি উদাহরণ সামনে রাখছি।

ক. মধ্যবিত্ত জীবনের রোমান্টিক চরিত্র প্রকাশ পেল শিশিরকুমারের মঞ্চে। কিন্তু সে মধবিত্ত চরিত্র আপনি-আমি নই। শুধু তাই নয়, যে রোমান্টিক কল্পনায় তাদের সৃষ্টি ঠিক সেই একই জাতের কল্পনায় নাদিরশাহ আলমগীরেরও সৃষ্টি। এবং শিশিরকুমারও আটকে রইলেন সেইখানে—একটা ফিউড্যালি ছায়াচ্ছন্ন রোমান্টিক মধ্যবিত্ত চরিত্রের মধ্যে। ['যুদ্ধোত্তর যুগে বাংলা মঞ্চে সংকট'/১৯৪৭]

খ. ষাটোর্দ্ধ বয়সে শিশিরকুমার বাংলাদেশে রেখে যাচ্ছেন এমন থিয়েটার যা কোনোরকমেই জাতীয় থিয়েটার বলে গর্ব করতে পারে না।...

যে-স্বাভাবিক অভিনয়ের জন্য একদিন তাঁর খ্যাতি হয়েছিল, সেইটাই আজ অসহ্য নাটুকে লাগে। দিন পালটে গেছে, সুর বদলে গেছে, তবু নাটকের এই মিথ্যা—hero-র দল exhibitionism-এর পরাকাষ্ঠা করে যাচ্ছেন, দর্শকদের শিক্ষা দেওয়ার বদলে কুশিক্ষা দিচ্ছেন ['নাটক'/আনুমানিক সন ১৯৫০-৫৪]

উদাহরণ দুটিতে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কী অসম্ভব ভাষায় এবং আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে শম্ভু মিত্র শিশিরকুমারকে নস্যাৎ করছেন। সদ্য গড়ে ওঠা বহুরূপী তখন হাঁটি-হাঁটি পা-পা করছে। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত দর্শক তখনও পর্যন্ত শিশিরকুমারের মধ্যবিত্ত রোমান্টিসিজম-তেই মগ্ন। দ্বিতীয় উদাহরণে শম্ভু মিত্র যেটাকে 'মিথ্যে হিরো' ও 'এগ্‌জিবিশন্‌ইজম্‌-এর চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা' বলছেন, সেটা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য। কেন-না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবল অভিঘাতে, ফ্যাসিবাদের নগ্ন আক্রমণে মানুষ যেখানে পুতুলে পরিণত, যুদ্ধের বাজারে ব্ল্যাকআউট-ব্ল্যাকমার্কেট-মজুতদার সমস্যা এবং সর্বোপরি তেতাল্লিশের ভয়াবহ মন্বন্তর—মৃত্যু আমাদের বধ্যবিত্তের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিচ্ছে, যখন হিটলারের কন্‌শেনট্রেশন ক্যাম্প আর হিরোশিমা-নাগাসাকির বিস্ফোরণ আমাদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সমস্ত হিসেব-নিকেশ গুলিয়ে দিয়ে মানুষকেই এক-একটা নির্বাসিত এককে পরিণত করছে—তখনও শিশিরকুমার যেন সময়ের উলটো পথে হেঁটে সেই ফিউড্যালি ছায়াচ্ছন্ন রোমান্টিকতাকেই আঁকড়ে থেকেছেন। সুতরাং ওই

মোহটা থেকে বাঙালিকে সরিয়ে আনতে শম্ভু মিত্র বেছে নিয়েছিলেন আক্রমণের পথ। সেটা ছিল ঐতিহাসিকভাবেই অনিবার্য একটা ব্যাপার।

কিন্তু এটাও অনিবার্য ছিল যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো তরুণ-অভিনেতা কিংবা শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষিত প্রতিভা সত্তরের আশেপাশের বৃদ্ধ শিশিরকুমারের থিয়েটারেই যাবতীয় মুগ্ধতা ও বিস্ময়ের উপাদানগুলি খুঁজে পাবেন! ততদিনে বহুরূপীর *রক্তকরবী*-র ঐতিহাসিক প্রযোজনা তৈরি হয়ে গেছে, *চার অধ্যায়*, *পুতুল খেলা*, *দশচক্র* এবং *রক্তকরবী*-র মধ্যে দিয়ে নবনাট্যের নতুন ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। শম্ভু মিত্র ততদিনে আমাদের ভারতবর্ষের আধুনিক থিয়েটারেই অত্যন্ত শিহরন জাগানো একটি নাম। এটা অত্যন্ত প্রত্যাশিত ছিল যে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তরুণ-প্রতিভা শম্ভু মিত্রের থিয়েটার-বোধে আকর্ষিত হবেন, মুগ্ধ হবেন—ঠিক যেভাবে তরুণ শম্ভু মিত্র বা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যরা শিশির ভাদুড়ির থিয়েটারে একদা মুগ্ধ হয়েছিলেন!

অশ্চর্য এই, যে সেটা তখনও পর্যন্ত ঘটেনি। ১৯৫৯, শিশিরকুমারের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনিই যেন একচ্ছত্র সম্রাট, থিয়েটার নেই, অর্থ নেই, বল নেই অথচ মুকুটহীন এই সম্রাটের পদপ্রান্তে দিনের-পর-দিন এসে বসে থেকেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯৫৮ 'নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ' গঠিত হল শিশিরকুমারকে সামনে রেখে। নবীন এবং প্রবীণ মিলিয়ে একদল মানুষ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের দেবকুমার বসু-র গ্রন্থজগৎ-এ এসে মিলিত হতেন। সপ্তাহে দুটো দিন শিশিরকুমারের কথা শোনার জন্য তাঁরা উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা করতেন। তাঁর মুখে পুরোনো নাটকগুলির পাঠ অভিনয় শুনতেন, নানা প্রশ্ন করে কৌতূহল নিরসন করতেন। ১৯৫৮-র ২ অক্টোবর শিশিরকুমারের সত্তরতম জন্মদিনটি নাট্য পরিষদের সদস্যরা পালন করেন। ওই দিনটি থেকেই শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিষদে যোগদান এবং শিশিরকুমারের সান্নিধ্যে আসা। শমীক তখন আঠারো-উনিশের যুবক। প্রেসিডেন্সির ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ-পঞ্চম বর্ষের ছাত্র। ততদিনে তিনি থিয়েটারের মধ্যে চলে এসেছেন তাঁর স্বাভাবিক টান থেকেই। বড়ো বউদি *পথের পাঁচালী* চলচ্চিত্রের সর্বজয়া-খ্যাত করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর থিয়েটার চলচ্চিত্রের আর-এক উৎসাহদাতা। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও ছিলেন 'নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ'-এর একজন সদস্য এবং শিশিরকুমার অনুরাগী।

যাই হোক, শমীকের ওই ডায়রি 'নাট্যাচার্যের সান্নিধ্যে' শিশিরকুমারের জীবনের শেষ-দশ মাসের কিছু মুহূর্তকে ধরে রাখা। সেই মুহূর্তগুলি কীভাবে তরুণ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিভূত করেছিল, তাঁকে থিয়েটার বোঝবার দৃষ্টি শিখিয়েছিল এবং বিশেষত ফুরিয়ে যাওয়া একটি সময়ের থিয়েটারকে চিনে ওঠার, বুঝে ওঠার অমূল্য

সুযোগ দিয়েছিল তা তাঁর ডায়রিতে পাই। 'সায়ক নাট্য বক্তৃতামালা'-য় শমীক শিশিরকুমার বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, সেখানে তিনি লিখেছেন—'...যে-নাটক আমরা দেখিনি, যে-প্রযোজনা আমরা দেখিনি, তারও ছবি, তারও ধ্বনি আমাদের সামনে মূর্ত হত। আমরা কোথাও সেই হারানো পরম্পরাকে গ্রহণ করতে পারতাম, ছুঁতে পারতাম, আবছা দেখতে পারতাম। তার অদ্ভুত একটা সুযোগ আমাদের হয়েছিল। আমার থিয়েটার দেখার বা বোঝার সূত্রপাত বা প্রথম পদক্ষেপ এই ছোট্ট গোষ্ঠীর মধ্যে।' [*থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা*, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়ক নাট্যপত্র ২০১১, পৃ, ১২-১৩]

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বাংলা থিয়েটারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক, অভিভাবক। তাঁর থিয়েটার বিষয়ে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, তাত্ত্বিক অবস্থান, খুব অল্প বয়সেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। সেই স্বীকৃতিরই অন্যতম নিদর্শন, শম্ভু মিত্র যখন বহুরূপীর জন্য এই তরুণকে ডেকে নেন—প্রবন্ধ লেখান তাঁকে দিয়ে।

আমার মনে হয়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থিয়েটার-বোধ কোনো বিশেষ একটি ধারণা কিংবা সময়ের বিশেষ কোনো প্রবণতার ছাঁচে তৈরি হয়নি। আসলে তিনি এমন একজন মানুষ যিনি একই সঙ্গে শিশিরযুগের ঐশ্বর্যকে বুঝেছেন, দেখেছেন সেই ঐশ্বর্যের ক্ষয়িষ্ণু পর্বটাকে। পালটে যাওয়া সময় ও বদলে যাওয়া যুগচিহ্নগুলো শিশিরকুমারের শেষ বয়সের থিয়েটারে কীভাবে রেখে গিয়েছিল, তার ছবি তিনি দেখেছেন। শিশিরকুমারের মুখ থেকেই শুনেছেন তাঁর ঐশ্বর্যযুগের আশ্চর্য সব বৈশিষ্ট্য! শিশিরকুমারের মুখ থেকেই *আলমগীর, দিগ্বিজয়ী, ষোড়শী, শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী*-র পাঠ-অভিনয় শুনে বুঝতে চেয়েছেন গিরিশযুগের নাটকের সংলাপ বলার ধরন, কণ্ঠস্বরের মডিউলেশন, মঞ্চ-প্রয়োগের নানান খুঁটিনাটি। এই অভিজ্ঞতাই তো শমীকের জোর তাঁর থিয়েটারবোধের শিকড়। তাঁর তাত্ত্বিকতার ভিত্তিভূমি তৈরি হয়েছিল ওই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই। নতুন ও পুরাতনের, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার তুল্যমূল্য বোধে, নতুনকে বিচার করবার অসামান্য দৃষ্টি তিনি পেয়ে যান ওই অভিজ্ঞতার জোর থেকেই। শিশিরকুমার ভাদুড়ির একশো পঁচিশতম জন্মবর্ষে পাঠককে যদি আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে শিশিরকুমারকে বুঝতে হয়, বুঝতে হয় তাঁর সেই বিপুল ক্যারিশমা এবং সেইসঙ্গে যদি বুঝে নিতে হয় শমীকের থিয়েটার বোধের উৎসটিকে, তাহলে শমীকের লেখা ডায়রি 'নাট্যচার্যের সান্নিধ্যে' আমাদের অবশ্যই ফিরে পড়া উচিত।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের ছবি দুটি নেওয়া হয়েছে জুন ২০১৩ সালে 'আজকাল' কর্তৃক প্রকাশিত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-এর *শিশিরকুমার* গ্রন্থটি থেকে।

শ মী ক ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

আমার ডায়েরী থেকে : নাট্যাচার্যের সান্নিধ্যে

১লা জুলাই, ১৯৫৯।।

কোন বন্ধুজনের চিঠি থেকে : "শোন—হ্যাঁ—সত্যি ব'লছি বিশ্বাস করো—ঠিক এখুনি, এই মুহূর্তে যদি সম্ভব হ'তো—ছুটে যেতাম তোমার বাড়ীতে আর তোমাকে ব'লতাম কাল সকালের বেদনাময় স্মৃতির কথা। সকাল হ'তেই কাগজ দেখে ছুটেছি ওঁর বাড়ীতে। সেখান থেকে গেছি কাশীপুর শ্মশানে। কিন্তু সব দুঃখ ছাপিয়ে আমার কান্না পাচ্ছিলো এই ভেবে যে কাল কাউকে আমি ওই শোকযাত্রার ভিড়ে পাইনি যাঁকে বাঙালী সংস্কৃতির উত্তরসূরী মনে হতে পারে।...'শিশিরকুমারকে তুমি বুঝেছো'—এই তোমার মন্তব্য। কিন্তু আমি জানি আমি বুঝিনি—না—না—কেউ বোঝেনি ওঁকে—কেউ

না—কেউ না—তাহ'লে আজ শোকযাত্রার রূপ ভিন্ন হ'তো। বাঙলাদেশের সমস্ত রঙ্গালয় আর চিত্রগৃহ পরমাত্মীয়ের বিয়োগব্যথা অনুভব ক'রতো। আর আমরা বাঙালী ছাত্ররা বাঙলা রূপলোকের চিত্ররথ গন্ধর্বের জন্যে চোখের জল ফেলতাম। তুমি শিশিরকুমারের অনুরাগী ভক্ত—সে নিষ্ঠা তোমার কর্মে ও কথায় পেয়েছি অনেকবার। নিজের মত ক'রে ভাষার দুর্লভ ক্ষমতাও তোমার আছে। তাই তোমার কাছে আজ কী বলবো বলো! শিশিরকুমারের নাম অচিরস্থায়ী নয়। কিন্তু তাঁর কাছে আমাদের ঋণস্বীকার শুধু স্বীকার ক'রেই যদি ফুরিয়ে যায়—তাঁকে আমরা কাজে না লাগাতে পারি যদি—যদি সুদে না বাড়াতে পারি—তবে এই হবে আধুনিক বাঙালী চিত্তের শক্তিশেল।"

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮।।

বাসে যেতে যেতে 'গ্রন্থজগৎ'-এর দেবকুমার বসুর সঙ্গে দেখা। খবর পেলাম, আগামী ২রা অক্টোবর নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের জন্মবার্ষিকী পালন ক'রবে—আমন্ত্রিত হ'লাম। জানলাম, নাট্যাচার্যকে ঘিরেই গ'ড়ে উঠেছে এই ছোট গোষ্ঠী—গোষ্ঠীর পুরোভাগে আছেন শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ রাম অধিকারী প্রমুখ। সেদিনই স্থির ক'রলাম, পরিষদের বৈঠকে নিয়মিত যোগ দেব।

[...তারপরে তিন মাস নব্য বাংলা নাট্য পরিষদের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলাম। নাট্যাচার্য নিয়মিতই আসতেন—নানা কথার কিছু কিছু আমি টুকে রাখতাম।]

৩রা অক্টোবর, ১৯৫৮।।

গতকাল নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পাশে ব'সে তাঁর কথা শুনেছি।

'নাটক জমানোর কথা ব'লছ? এখনও একটা পাদপীঠ দাও, আর যে-কোন একটা নাটক দাও, জমিয়ে দিচ্ছি। নাটক ভালো হোক খারাপ হোক, **It must suffer a sex-change, if the actor is worth anything.**'

'যখন আমি আর দর্শক এক হ'য়ে যাই, যখন জানি, আমি কথা ব'লছি, আর এতগুলো মানুষ নাচছে, that one moment'—ব'লতে ব'লতে শিশিরকুমার থেমে গেছলেন। সারা ঘর স্তব্ধ হ'য়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে—অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে ব'ললেন, 'সে আমি বোঝাতে পারব না।'

'মাঝে মাঝে এক-একটা পার্ট অভিনেতাকে গ্রাস করে। কিন্তু অভিনেতা কখনও পুরোপুরি নিজেকে ভুলতে পারে না—সে মনে রাখে, আর এগোলে আলো পাবে না, সে জানে, পাশের লোকটার মুখ দেখাতে হবে।'

কবিতা সম্পর্কে কথা হ'চ্ছিল। প্রথমে ইংরেজি কবিতার প্রসঙ্গ। শিশিরকুমার ব'ললেন, 'টেনিসনের কবিতা আমার কোনদিন ভালো লাগে নি, আজো লাগে না। ব্রাউনিং ভালো। আমার বায়রনকে খুব ভালো লাগে—হয়তো খুব depth নেই—কিন্তু Don Juan আশ্চর্য। আধুনিক ইংরেজি কবিতা? আমার মন ব'লছে, ও একশো বছর পরে টিকবে না।' কে একজন বাংলা কবিতার কথা তুললেন—শিশিরকুমার ব'ললেন, 'আধুনিক বাংলা কবিতার প্রগতির কথা ব'লছ? ইংরেজি কবিতায় সুইন্‌বার্ন অবধি যে variety আছে, তা' আমাদের নেই।'

আবার অভিনয়ের কথা এল। 'আটচল্লিশ বছর ধ'রে অভিনয় ক'রেছি, ১৯০৮ থেকে ১৯৫৬। দু'টো যুগকে বেঁধে রেখেছি। আমার থিয়েটারের দরজা খোলা থেকেছে। কত নদী ব'য়েছে, শুকিয়ে গেছে। কত লোক এসেছে, কত লোক গেছে। আমি অভিনয় ক'রে গেছি। একবার শুধু বাইরে গেছি—নিউইয়র্কে গিয়ে ছ'মাস ছিলাম, অভিনয় ক'রলাম।'

হঠাৎ কথার মধ্যে গর্জন ক'রে উঠলেন, 'জেনে রেখো, দেবু (দেবব্রত মুখোপাধ্যায়— শিল্পী), a white man can never be my friend!'

বিদায় নেবার সময় প্রণাম ক'রে পরিচয় দিলাম। উনি আশীর্বাদ ক'রে ব'লবেন, 'তোমরাই সব, তোমরা বড় হও। I'm drying up.'

কাল 'নরনারায়ণ'-এর শেষ পর্ব প'ড়ে শোনালেন।

১৭ই অক্টোবর, ১৯৫৮।।

কালকে শিশিরবাবু 'দিগ্বিজয়ী' পাঠ আরম্ভ ক'রলেন।

কথাপ্রসঙ্গে ব'ললেন, 'বিলেতকে একটু অগ্রাহ্য ক'রতে হবে। চারশো বছর ধ'রে 'যাত্রা' চ'লছিল, তাকে ছেড়ে এক লাফে থিয়েটার ধ'রলাম—সেখানেই আমাদের দোষ হ'য়েছিল। আমাদের 'যাত্রা' এখনও মরে নি।' ভোলা চট্টোপাধ্যায় (শিল্পী) যোগ ক'রলেন, 'আমাদের 'যাত্রা' অজর, অমর, অক্ষয়—আত্মার মত।' শিশিরকুমার হেসে সায় দিলেন।

কোন বাঙালী কথাসাহিত্যিক মস্কোতে চারদিন কাটিয়ে বিরাট বই লিখে ফেলেছেন। সেই প্রসঙ্গে কথা উঠতে ভোলাদা ব'ললেন, 'কোন দেশ সম্পর্কে লিখতে গেলে সেখানে যাও, সেখানকার কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়, বিয়ে কর, বারো বছর পরে নিজের দেশে ফিরে এসে বই লেখ।' শিশিরবাবু ব'ললেন, 'তখন কলেজে ফার্স্ট ইয়ার-এ পড়ি, গোঁফের রেখা ওঠেনি। হরিনাথ দে-কে গিয়ে একদিন ব'ললাম, 'স্যর, ফ্রেনচ্ শিখতে চাই, কী বই পড়ব?' উনি ব'ললেন, 'Look here, my boy, the best

way to learn a language is to have a mistress who speaks that language.' বোঝ আমার অবস্থা!'

ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রসঙ্গে শিশিরবাবু ব'ললেন, 'The dramatist must have a pictorial vision of a procession of events.'

২৪শে অক্টোবর, ১৯৫৮।।

কালকে শিশিরবাবু 'দিগ্বিজয়ী' পাঠ শেষ ক'রলেন।

কথাপ্রসঙ্গে ব'ললেন, 'ভগবান্ আমাকে কোন সুবিধে দেননি—আমার চোখ ছোট, আমি বেঁটে, আমি কুৎসিত। তাই বলি, ওসবে দুঃখ করার কিছু নেই—you have to fight with them, যদি চোখ ছোট হয়, তাদের খুঁচিয়ে বের কর—let them speak.'

'শুধু কবিতা পড়ার কথা বলি কেন, নাটকেও একই কথা একেক দিন একেকভাবে বুঝি, একেকভাবে বলি। শুধু base টা ঠিক থাকে, আর সব-কিছু বদলে যায়। এইটেই স্বাভাবিক, you have to live through the lines.'

'ষোড়শী'র রচনাকালে শিশিরকুমার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একত্রে কাজ ক'রেছেন, যামিনী রায় তাঁর মঞ্চের সজ্জা ক'রে দিয়েছেন, দৃশ্যপট এঁকে দিয়েছেন—সেই সব কথা ব'ললেন।

ভোলা চট্টোপাধ্যায় আধুনিক কবিতার কথা ব'লছিলেন, 'সেদিন প'ড়লাম—'আকাশে চাঁদ ছিল'। আরে, আকাশে কি হনুমান থাকে যে, চাঁদ ছিল ব'লে কবিতা লিখতে হবে?'

১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৮।।

মাঝখানে দিনদুয়েক বাদ প'ড়েছিল। কাল আবার 'গ্রন্থজগতে' গেলাম। শিশিরবাবু 'ষোড়শী' পাঠ শেষ ক'রলেন।

'ষোড়শী' প্রসঙ্গে ব'ললেন, 'আমি শরৎচন্দ্রকে ব'লেছিলাম, আপনি যখন লেখেন, তখন আপনি সব। কিন্তু এখানে আমি রাজা, আমার কথা শুনতে হবে। শরৎচন্দ্র শুনতেনও আমার কথা। কিন্তু মাঝখানে বাইরের লোক মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, ওঁকে দিয়ে ব'লল, আরে, ঐ তেড়ের তেড়ে শিশির ভাদুড়ী, ওর কথা শুনে চ'লেছেন? যখন 'ষোড়শী' বই বেরুল, তখন চেষ্টা ক'রলেন আমার suggestion-এ যা নিয়েছিলেন, তা সব পুঁছে ফেলতে। শেষ দৃশ্যে ডাক্তার আসার পরেই জীবানন্দের কথা সস্তা সেন্টিমেন্ট্যালিটি, মরবার সময় মানুষ অমন ক'রে কথা বলে না।'

ভালো অভিনেতা কে? শিশিরকুমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন, 'শিক্ষা সকলেরই দরকার হয়। যে সেই শিক্ষাকে আপন ক'রে নিতে পারে, তাতে নিজের কিছু ঢেলে দিতে পারে, সে-ই সু-অভিনেতা। একটা নাটক কি একদিনে তৈরি হয়? অনেক রিহার্সাল চাই। একটা পার্ট অভিনেতার মধ্যে ধীরে ধীরে sink করা চাই। অবশ্য যার নিজের ভিতরে কিছু আছে, তার কথা আলাদা।'

বিনয় দত্ত শেক্স্পীয়রের নাটকের সূত্র-আবিষ্কার-প্রয়াসের কথা তুললেন। শিশিরকুমার ব'ললেন, 'লোকে বলে, শেক্স্পীয়র প্লট চুরি ক'রেছেন। তাতে কিছু এসে যায় না। তিনি যেন একটা ভাঙা হাড় থেকে এক পরমা সুন্দরী নারী সৃষ্টি ক'রেছেন?'

শিশিরবাবু ব'ললেন, 'রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস লিখতে জানতেন না। যদি কোনটা অন্তত কিছুটা perfect হ'য়ে থাকে, তবে তা' 'চতুরঙ্গ'। বিনয় দত্ত আপত্তি ক'রলেন, 'চতুরঙ্গ'-কে technically perfect ব'লবেন কোন হিসেবে? দামিনী যে-ভাবে বেড়ে যায়, তাতে উপন্যাসের structure ধ'সে পড়ে।' শিশিরবাবু জবাব দিলেন, 'Life-এ অমন হয়।' বিনয়বাবু : 'Life-এ অনেক কিছুই হয়; কিন্তু নভেলের structure আছে। তাতে সবকিছু হ'তে পারে না; তার Form আছে।' রাম অধিকারী যোগ ক'রে দিলেন, 'অর্থাৎ তার জিওমেট্রি।' শিশিরবাবু জবাব দিলেন, 'যদি তা-ই হয়, তবে Art-কে ছেড়ে Life-কে নেব, তাকেই বড় ব'লে মানব।' বিনয়বাবু ইতি টানলেন, 'তা' ব'লতে পারেন।' রাম অধিকারী অনুযোগ ক'রলেন, 'বিনয়, তোমাদের মত যাদের এমন analytical mind, তারা কখনও রসগ্রাহী হ'তে পারে না।'

কে একজন শিশিরবাবুকে জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'আপনার জীবনের best part কী?' বিরক্ত হ'য়েই শিশিরকুমার উত্তর দিলেন, 'কোন অভিনেতাই অমন কিছু ব'লতে পারেন না। যখন যে পার্ট করি, তখন সেটাই best ব'লে মনে হয়। দিগ্বিজয়ী ক'রে যেমন আনন্দ পাই, জীবানন্দ ক'রেও তেমনই।'

নাট্যোৎসবের কথা চ'লছে। শিশিরকুমার ব'ললেন, 'এবার আমাকে 'আলমগীর' ক'রতেই হবে। ও নাটকটা আমার জঘন্য লাগে। লোকে কেন চায়, বুঝতে পারি না।'

কথায় কথায় ব'ললেন, 'আমার সত্তর বছরের জীবনে দেখেছি, মানুষ একটা কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার। তার কোন ব্যাপারে কোন absolute statement করা যায় না।'

১৮ই নভেম্বর, ১৯৫৮।।

কাল শিশিরবাবু 'মালিনী'র মহড়া আরম্ভ ক'রলেন।

'আমার যে বয়স হ'য়েছে তারই প্রমাণ আজকাল আর কাঠের উপর বসতে পারি

না। যখন মনোমোহন থিয়েটারে ছিলাম, তখন শানের মেঝেতে শুতাম; তখন শরীর বেদনাকে welcome ক'রত।'

কোন অভিনেতার ত্রুটি শুধরাতে গিয়ে ব'ললেন, 'অভিনয়ে হাতের movement সবাই আরম্ভ করে কোমর থেকে, বিশেষত মেয়েরা। Movement আরম্ভ হবে shoulder থেকে।'

২৪শে নভেম্বর, ১৯৫৮।।

'মালিনী'র মহড়া চ'লছে। শিশিরবাবু উচ্চারণের কথা ব'লছিলেন, 'ওঁর মতে হুগলীর উচ্চারণই সবচেয়ে শুদ্ধ; ওঁর নিজের কথায় আগে নদীয়া-কৃষ্ণনগরের উচ্চারণ ছিল, এখন আর তা' নেই। গিরিশ ঘোষের দুটো কথায় ভুল হ'ত, 'মুন্ত্রী' আর 'কুহুক' : ' 'মুন্ত্রী'টা আমি আয়ত্ত করি নি, তবে 'কুহুক'-এর ভুলটা আমারও হয়, কুহুকের কুহকে আমি এখনও আচ্ছন্ন।'

'অধিকাংশ অ্যামেচার অভিনেতা কথা বলে ঠোঁট থেকে। কথা ব'লবে হৃদয় থেকে, আরো গভীর ক'রে ব'লতে চাইলে পেট থেকে। সাধারণ জীবনে কথা বলা আর মঞ্চে কথা বলার মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। এখনকার ছেলেদের ব'ললে হাসে, তবু বলি : রোজ সকালে ছাদে উঠে গলা ছেড়ে চেঁচাও, গলা হবে।'

রবীন্দ্রনাথের নাটক-প্রসঙ্গে শিশিরকুমারের বক্তব্য : 'রবীন্দ্রনাথ কখনও আমাদের 'স্টেজ'-এর কাছে আসতে পারেননি, সেইখানেই ওঁর নাটকের দুর্বলতার কারণ। আমি যখন ওঁকে ডাকলাম, তখন একের পর এক ধাক্কা এসে ওঁকে আসতে দিল না।'

২৭শে নভেম্বর, ১৯৫৮।।

আজ 'শর্মিষ্ঠা' পড়া শেষ হ'ল। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীবিনয় দত্তকে ব'ললেন, 'জানো, বিনয়, আমি রিহার্সালের সময় কখনও কোনদিন বসিনি। জন্মলগ্নের শনি-মঙ্গলে মিলে হাতটা ভেঙ্গে এখনই আমাকে বুড়ো ক'রে দিয়েছে। তাই, ব'সে থাকতে হয়।'

'শর্মিষ্ঠা' নাটকে পরিচারিকাদের কাননে যযাতির চাঞ্চল্য দেখে ডাঃ রাম অধিকারীকে ব'ললেন, 'ভীষ্মদেব, রামচন্দ্র, আর দু'একজন ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যের সব ক'টা মিন্‌শে bogus.'

১লা ডিসেম্বর, ১৯৫৮।।

'মালিনী'-র মহড়া চ'লছে। ক্ষেমঙ্করের চরিত্রাভিনেতাকে উপদেশ দিতে গিয়ে ব'ললেন, 'ঐ-যে কথার সংলগ্নতাটা, ওটা ছেড়ে দাও। প্রত্যেকটা কথা যেন আলাদা আলাদা দানা বেঁধে থাকে। তাতে ছন্দ ঠিকই থাকবে।'

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮।।

কাল 'কৃষ্ণকুমারী'র প্রথম অঙ্ক পড়া হ'ল। পাঠশেষে নাট্যাচার্য ব'ললেন, ' 'কৃষ্ণকুমারী'-র পর বাংলা নাটক এক পা-ও এগোয়নি—ভাষা হয়তো ব'দলেছে— construction-এর বিচারে বরং পিছিয়েছে। আগে Todd প'ড়ে শোনালে দেখতে, এতটুকু বেঁকিয়েছেন, অথচ dramatize ক'রে ফেলেছেন। কি বিরাট প্রতিভা!'

নাট্যাচার্যের জীবনী এখনও কেউ লেখেনি। জীবনের নানা অধ্যায়গুলো কথার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। আগে একদিন ব'লেছিলেন হুণ্ডীর দালালি করার কথা। কালকে ব'ললেন হাইকোর্টে articled clerk থাকার কথা—পেছনের দিকে ব'সতেন, ভালো কেস থাকলে শুনতে যেতেন—ঐ প্রসঙ্গে রাসবিহারী ঘোষের কথা উঠল। রাসবিহারীর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর—ব'লতে পারতেন না ভালো—'মাতালের চেরা গলা'। লেজিস্‌লেটিভ কাউন্‌সিলে রাসবিহারীর বক্তৃতার প্রথম কয়েকটি ছত্র মুখস্থ ব'লে গেলেন—'আগে আরো মনে ছিল, এখন ভীমরতি হ'য়েছে, ভুলে গেছি।' বক্তৃতার পুরোটা ছেপে স্টেট্‌সম্যান্ শিরোনামা দিয়েছিল—'The brilliant Rashbehari'—শুরু হ'য়েছিল কালিদাস থেকে quote ক'রে, শেষ হ'য়েছিল "Little Dorrit"-এর লাইন দিয়ে—'আর ভেতরটা full of reminiscences, ইংরেজি আর সংস্কৃত থেকে।'

গিরিশ ঘোষের প্রতি শিশিরকুমারের শ্রদ্ধা সুগভীর। 'মধুসুদনের কথা ছেড়ে দিলে বঙ্কিম আর রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আর বড় লোক কোথায়? আসতে হবে সেই গিরিশ ঘোষের কাছে। তা তাঁকে তো আর আমরা স্বীকার ক'রব না। তিনি বাগবাজারে থাকতেন, মদ খেতেন।'

যোগীন্দ্রনাথ বসুর মধুসূদন-জীবনী প্রসঙ্গে বললেন, 'ও বইটা জঘন্য—দু'তিন পাতার পর পড়া যায় না। জীবনী লেখার নাম ক'রে খুব একচোট গালাগালি দিয়ে নিয়েছে। ও লোকটা ছিল পিউরিটান, দেওঘরের ইস্কুলের সেকেণ্ড্ মাস্টার : ও মাইকেলকে বুঝবে কী ক'রে?'

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮।।

'মালিনী'র মহড়া চ'লছে। দেরি ক'রে পৌঁছলাম। শিশিরবাবুর নাট্যোৎসবের প্রস্তুতিতে সবাই ব্যস্ত, খুব হৈ চৈ। আজ মহড়া খুব ভালো জ'মল না। তবু নাট্যাচার্যের নালিশ নেই, বিরক্তি নেই, ক্লান্তি নেই।

গতকাল 'চন্দ্রগুপ্তে' চাণক্যের ভূমিকায় ওঁর অভিনয়ের কথা উল্লেখ ক'রে একজন ব'ললেন, ওঁকে কাল এতটুকু অসুস্থ মনে হয়নি। উত্তরে ব'ললেন, 'অভিনয়ের সময়ে কবে আমাকে অসুস্থ দেখেছ?'

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮।।

গত ১১ই ডিসেম্বর শিশিরকুমার অভিনীত 'মাইকেল মধুসূদন' দেখলাম। এই নিয়ে দু'বার দেখা হ'ল। শিশিরকুমারের অভিনয় বিচারের অধিকার আমার নেই। তাই এইটুকু বলা, অভিভূত হ'য়েছি। শিশিরবাবু প্রায়ই বলেন, 'গলাকে খেলাতে হবে।' সেই গলাকে খেলানো যে কি বিরাট ব্যাপার, তা' একমাত্র উনিই জানেন, জানাতে পারেন।

১২ই ডিসেম্বর দেখলাম 'ষোড়শী'। আবার অভিভূত হ'লাম। বার্ধক্য, আঘাত, শারীরিক অসুস্থতার সমস্ত অক্ষমতাকে জয় ক'রে নাট্যাচার্যের অভিনয়—কিন্তু কি প্রচণ্ড সে জয়!

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮।।

'মাইকেল মধুসূদন' ও 'ষোড়শী'র 'টেনশন'-এর পর কাল 'বিজয়া' দেখে আবার অবাক হলাম। সহ-অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের জঘন্য অভিনয় সত্ত্বেও একা শিশিরকুমার নাটককে তরিয়ে নিয়ে গেছেন।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮।।

কাল আবার দেখলাম 'মাইকেল মধুসূদন'—এই আমার তৃতীয়বার। এবারকার আনন্দ অন্যরকম। প্রত্যেক দৃশ্যের আগেই মনে মনে কল্পনা ক'রে নিয়েছি নাট্যাচার্যের দৃষ্টি, কণ্ঠ, ভঙ্গিমা—সব মিলিয়ে অভিনয়। কিন্তু প্রতিবারই নাট্যাচার্য আমার কল্পনাকে ভেঙে তাকে অতিক্রম ক'রে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে চ'লে গেছেন।

১৬ই মে, ১৯৫৯।।

গত ১০ই মে শিশিরবাবুর 'রীতিমতো নাটক' দেখলাম। হাসি আর কান্নাকে একান্ত সান্নিধ্যে রক্ষা করা সহজ নয়। জাত-শিল্পীর মতই শিশিরবাবু সেই অসাধ্যসাধন ক'রেছেন। 'মঁসিয়ে ভার্দু' বা 'লাইম্‌লাইট'-এর চ্যাপলিনকে মনে পড়ে। 'ফাউন্টেন পেন' বা 'হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ'-এর সঙ্গে বিকৃতমস্তিষ্ক রসিকতার পরমুহূর্তেই 'সেদো, একটু ঠাণ্ডা জল' ব'লে সেই ভাবগম্ভীর আর্তনাদ—অভিনয়বিচারে এটা অসাধারণ। এক-একটা কথা নাট্যাচার্য অনেক সময়ে প্রকাশগুণে অবিস্মরণীয় ক'রে রেখে দেন। 'রীতিমতো

নাটক'-এর একটা মুহূর্ত এমনি অবিস্মরণীয় থাকবে। দিগম্বরবাবু (শিশিরকুমার) সান্ত্বনাকে (রেবা দেবী) ব'লছেন, 'যাবো অনেক দূরে'—অনেক অনেক দূরে—যেন কোন মেরুপ্রান্তে—দূরত্বের এক আশ্চর্য অনুভূতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে—পরমুহূর্তে গলাটা সামান্য নামিয়ে, 'এই পাশের ঘরে'—একান্ত নিকট—একান্ত সন্নিহিত—নেহাৎই ঘরোয়া—এক জগৎ থেকে অন্য জগতে। অসংখ্য কবিতার আবৃত্তির মধ্যে দু'টো স্মরণীয়—'এই ক'রেছ ভালো, নিঠুর' ও 'জনম অবধি হম্ রূপ নেহারনু'। আবৃত্তিশেষে সান্ত্বনাকে প্রশ্ন করেন, 'কিছু বুঝলে?' সান্ত্বনা ঘাড় নেড়ে জানান, 'হ্যাঁ'। দিগম্বরবাবুর উত্তর, 'তোমার ঐ 'ফাউন্টেন পেন'-এর মত কিছু বোঝনি'—এ যেন বাংলাদেশের মানুষের কাছে নাট্যাচার্যের অনুযোগ।

[...সেদিন ভাবতেও পারিনি, শিশিরকুমারকে আর কোনদিন দেখতে পাব না। সেইদিন তাঁর শেষ অভিনয়। তিরিশে জুনের খবরের কাগজের কালো হরফে শেষ খবর পেয়েছিলাম।]

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০।।

মাত্র কয়েকটা মাস কাছে থেকে দেখেছিলাম। সুনাম-দুর্নাম যাচিয়ে দেখার সময় পাইনি, চেষ্টাও করিনি। মানুষ হিসেবে তাঁকে শ্রদ্ধা ক'রেছি, তাঁর প্রতিভার প্রকাশে অভিভূত হ'য়েছি—তাঁকে বিচার করার সাহস পাইনি—সে-অধিকার আমার নেই, বুঝেছি। 'শিশিরবাবুর অভিনয় 'ইন্‌ষ্টিটিউটে' দেখে এসে পথের মোড়ে ফুটপাথে তাই নিয়ে মেতে থাকা'—শতাব্দীর শুরুতে বিভূতিভূষণের যে অভিজ্ঞতা—শতাব্দীর মধ্যকালে আমার জীবনে সেই অভিজ্ঞতা পেয়ে ধন্য হ'য়েছি।

বয়সে সত্তরের সীমা পেরিয়েও শিশিরকুমার ক্লান্ত হননি, চ'লতে ভোলেননি—জীবনের শেষ বছরে তাঁকে দেখেছি, স্ট্যানিস্‌লাভ্‌স্কি ও বার্টোল্ড ব্রেখ্‌ট্-এর বই প'ড়ছেন—আগ্রহ আর শ্রদ্ধা নিয়ে। আমি দেখেছি, পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে রঙ্গালয়ের ক্ষেত্রে, শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে যে-কোন সামান্যতম আন্দোলন তাঁকে আগ্রহে-কৌতূহলে চঞ্চল ক'রে তুলত। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর খোলা মনে চিন্তার ধারা কখনও রুদ্ধ হয়নি।

নাটকের চরিত্রকে পরিবেশ প্রভাব সীমিত পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত মানুষ হিসেবে দেখবার দুর্লভ ক্ষমতা ছিল ব'লেই শিশিরকুমার নাটককে বাস্তবের এত কাছে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের নাদির শাহ্ মেষপালকের সন্তান—সেই অতীতকে অতিক্রম ক'রতে পারার মধ্যেই তার যা-কিছু মহত্ত্ব—তাই সেই অতীতকে ভুললে চ'লবে না। শিশিরকুমারের অভিনয়ে নাদির শাহের চলনে ঘোড়দৌড়ের মাঠের ওস্তাদ

ঘোড়সওয়ারের হাঁটার চাল—মেষপালকের হাঁটার স্বাভাবিক অভ্যস্ত ভঙ্গী—সেই অতীতকে প্রতিষ্ঠা করে, সঙ্গে সঙ্গেই নাদির শাহের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ রূপটিকে প্রকাশ করে। নাদির শাহ্ রাজবংশজাত শৌখিন দিগ্বিজয়ী নন—তিনি এক ধারে দিগ্বিজয়ী আর রুক্ষ পার্বত্য প্রদেশের অশিক্ষিত মেষপালক, জীবিকার জন্য আর জীবনের জন্য সংগ্রাম ক'রতে অভ্যস্ত—তাই নাদির শাহ্ 'শিভাল্‌রি'র শৌখিনতায় আস্থা রাখেন না—তিনি দুর্বিনীত, নৃশংস। 'রঘুবীর' নাটকে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে লুকনো ভীলসন্তান নিজেকে চিনতে পেরে উত্তাল উদ্দাম হ'য়ে ওঠে— মল প'রে কথার তালে তালে সে মঞ্চের ওপর প্রায় নাচতে থাকে, 'সংহার, সংহার' ব'লে দুই পা তুলে লাফাতে থাকে। এতদিনের অবরুদ্ধ প্রাকৃত সত্তা যখন প্রশান্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাঁধ ভেঙে দুর্বার গতিতে বেরিয়ে আসে—তখন অন্য কোনভাবে সেই ঘটনাকে প্রকাশ করা যায় না। সেই দৃশ্য দেখে এ-কালের কোন প্রখ্যাত অভিনেতা অভিভূত হ'য়ে গেছলেন : 'এর প্রবল ভীষণতায় আমার মনে হয়েছিল যে আমি ম'রে গেছি। আমার জীবনে বিরাট শিল্প যে ক'বার আমাকে মুহ্যমান ক'রে দিয়েছে এটি তার মধ্যে একটি।' আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় অন্য মানুষ কেঁদে উঠতে পারে—কিন্তু 'আলমগীর'-এর ঔরঙ্গজেব অন্য কোন মানুষের মত নয়—তাই অমানুষিক জান্তব আর্তনাদে সে নিজেকে প্রকাশ করে।

একটি কবিতার জন্ম এক আশ্চর্য ঘটনা। সৃষ্টির মুহূর্তের দুর্ভেদ্য রহস্যকেও শিশিরকুমার ভেদ ক'রতে গেছেন 'মাইকেল মধুসূদন' নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে। 'ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন'—'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র এই দুটি ছত্রের জন্ম সাধারণ ঘটনা নয়। একটি মানুষ নিজের চেতনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এক স্বপ্নলোকে পৌঁছে যায়—সেখানে বিশ্বমানবের চেতনায় গভীরতম অনুভূতিগুলি সে অনুভব ক'রতে পারে—পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগৎ থেকে কল্পনায় মায়ালোকে যাত্রার দুর্লভ মুহূর্তেই কবিতার জন্ম। সেই আকর্ষণীয় দুর্লভ মুহূর্তটিকেও শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। একটা মানুষের সমগ্র সত্তায় সেই প্রচণ্ড বিপ্লব তাঁর অভিনয়ে প্রত্যক্ষ ক'রেছি।

'মালিনী'র মহড়ার লক্ষ্য ক'রেছি, নাটকে কথোপকথনের ক্ষেত্রে সকল ভঙ্গিকে তিনি বর্জন ক'রেছেন—নিজের বুদ্ধি দিয়ে প্রত্যেকটি কথাকে উপলব্ধি ক'রে তবে তাকে প্রকাশ করার নীতি শিশিরকুমার বুঝেছিলেন তথা মেনেছিলেন। নাটকে কথা বলার কোন বিশেষ সুর বা ভঙ্গি তিনি চর্চা করেননি (যেমন চর্চা ক'রেছেন শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র—'রক্তকরবী', 'পুতুলখেলা' ও 'শুভবিবাহ'-এ তৃপ্তি মিত্রের বাচনভঙ্গী তাই কখনও বদলায় না)। একটি নাটক পাঠ করার সময়ে বিভিন্ন চরিত্রের চরিত্রগত বাচনভঙ্গীর বিচিত্রতা তিনি রক্ষা ক'রতেন—প্রত্যেকটি চরিত্রকে কোন-না-কোন ভাবে

বিশিষ্টতা দান ক'রতেন। ভারী থেকে হালকা, সুরেলা থেকে বেসুর, গভীর থেকে অগভীর এক স্তর থেকে অন্য স্তরে তাঁর কণ্ঠস্বর বিচরণ ক'রত—কণ্ঠস্বরের গভীরতার সামান্য স্তর-পরিবর্তনেই তিনি বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশ ক'রতেন। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্য-আত্রেয়ীর মিলনের দৃশ্যে (শিশিরকুমারের কণ্ঠে আবৃত্তি শুনেছিলাম), 'মাইকেল মধুসূদন' নাটকে বিদ্যাসাগরের কাছে মধুসূদনের আশীর্বাদ-প্রার্থনার দৃশ্যে ও 'ষোড়শী' নাটকে ষোড়শীর কুটীরে সপ্তম দৃশ্যে ষোড়শী-জীবানন্দের সাক্ষাৎকার-কালে কণ্ঠস্বরের 'মডিউলেশন'-এ শিশিরকুমার অসাধ্যসাধন ক'রতেন। কণ্ঠস্বরের এমন সহজ-সঞ্চরণ ক্ষমতা আর কোন অভিনেতার গলায় পাইনি—শম্ভু মিত্র 'মডিউলেশন'-এর চর্চা ক'রে থাকেন, সীমিত ক্ষেত্রে সফলতাও অর্জন ক'রেছেন, কিন্তু নাট্যাচার্যের কণ্ঠস্বরের দূরপ্রান্তচারী বিচিত্রতা তাঁর গলায় নেই।

কোন বিশিষ্ট বাঙালী নাট্য-সমালোচক শিশিরকুমারকে বাংলা রঙ্গালয়ের প্রথম 'প্রয়োগকর্তা' ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন। মঞ্চে মঞ্চোপকরণের বাহুল্য বর্জন ক'রলেও উপকরণে-সাজ-পোশাকে-দৃশ্যসজ্জায় নাটকের ঐতিহাসিকতা রক্ষায় তিনি সচেষ্ট ছিলেন। 'রীতিমতো নাটকের' অভিনয়ে অডিটোরিয়ামের ব্যবহার বাংলা রঙ্গালয়ের প্রয়োগকলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—উত্তরকালে গণনাট্য সংঘ ও অপেশাদারী রঙ্গালয় এদিকে সচেষ্ট হ'লেও শিশিরকুমারের সাফল্য অর্জন ক'রতে পারেননি। 'সীতা' নাটকে পাদপ্রদীপ তুলে দিয়ে স্বাভাবিক আলোক-সম্পাতের প্রয়োগে শিশিরকুমার একদা বাংলা রঙ্গালয়ের আলোক-প্রয়োগরীতিকে এক যুগ এগিয়ে দিয়েছিলেন। অভিনয়-শিক্ষায় যে নীতি তিনি অনুসরণ ক'রতেন, তাতে শিক্ষার্থী অভিনেতার অভিনয়-ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হ'ত। শিশিরকুমারের শিক্ষায় যে অভিনেতারা লাভবান হ'য়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, যোগেশ চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ছবি বিশ্বাস, মণি শ্রীমানি, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কঙ্কাবতী দেবী, প্রভা দেবী, রেবা দেবী। নাট্যকলার সবদিকেই সমান দৃষ্টি তিনি রাখতে পেরেছিলেন ও সমান ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন ব'লেই শিশিরকুমারের প্রয়োগনৈপুণ্যকে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য, বাংলা রঙ্গালয় শিশিরকুমারের শিক্ষাকে আত্মস্থ ক'রতে পারেনি। তাই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে তৃতীয় শ্রেণীর নাটক শতরজনী অতিক্রম করে—শিশিরকুমারের জাতীয় রঙ্গালয়ের স্বপ্ন পূর্ণ হয় না।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার ডায়রী থেকে : নাট্যাচার্যের সান্নিধ্যে' প্রথম প্রকাশিত হয় *প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা*-র অকচত্বারিংশৎ বর্ষ, এপ্রিল ১৯৬০ সংখ্যায়। ওই সংখ্যাটির 'সম্পাদনী সভা'-র সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক শ্রী অমল ভট্টচার্য। সভার অন্যান্য সদস্য—অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীহীরেন গঙ্গোপাধ্যায়। কর্মসচিব হিসেবে নাম ছিল শ্রীরূপেন্দু মজুমদার-এর এবং সম্পাদিকা ছিলেন শ্রীগায়ত্রী চক্রবর্তী। গায়ত্রী চক্রবর্তী তখন প্রেসিডেন্সির ফিফ্‌থ ইয়ার-এর ছাত্রী, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁরই সহপাঠী ইংরেজি বিভাগের ছাত্র।

১৯৫৯-এর ২৯ জুন মধ্যরাত্রে শিশিরকুমার ভাদুড়ি মারা যান। তার বছর তিনেক আগে ২৪ জানুয়ারি ১৯৫৬ তারিখে শিশিরকুমার শ্রীরঙ্গম মঞ্চে তাঁর শেষ অভিনয় করেন। তারপর থেকে বাকি জীবনে তিনি রঙ্গমঞ্চ-হীন হয়েই থেকেছেন। অবশ্য অভিনয় থেকে তখনও পর্যন্ত সরে আসেননি। ১৯৫৭-তে মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে *জীবন-রঙ্গ* অভিনয় করে। *নাট্যাচার্য শিশিরকুমার* গ্রন্থে শ্রীশংকর ভট্টাচার্যের দেওয়া তথ্য অনুসারে নাটকটির 'বোধহয় এগারোটি শো' হয়েছিল। শিশিরকুমার অমরেশ-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এরপর থিয়েটার সেন্টার-এর ক্ষুদ্র মঞ্চে করেছিলেন *সধবার একাদশী*, এন্টালি কালচারাল কনফারেন্স-এ করেন *মাইকেল*। মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরে বেশ কিছু আমন্ত্রিত অভিনয়ও করতে গেছেন। ১৯৫৮-তে শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গ-গোষ্ঠী কয়েকজন মানুষ একত্রিত হয়ে 'নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ' গঠন করেন। শিশিরকমার ভাদুড়িকে কেন্দ্র করেই এই গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল, ঠিকানা ছিল ৬ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট-এর দেবকুমার বসুর 'গ্রন্থজগৎ'-এর ঘর। এই 'নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ'-এর সদস্য কারা ছিলেন? শংকর ভট্টাচার্যের দেওয়া তথ্য অনুসারে নামগুলি হল :

> শিল্পী শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায়, রসজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত, ডা: রাম অধিকারী, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও গ্রন্থপ্রকাশক শ্রীদেবকুমার বসু, নাট্যসমালোচক ডা: রবি মিত্র, সাহিত্যিক শ্রীশিবনারায়ণ রায়, শ্রীকুমারেশ ঘোষ, শ্রীগৌরীশংকর ভট্টাচার্য, শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ, 'উদয়ের পথে' রচয়িতা জ্যোর্তিময় বসু রায়, চিত্র ও

নাট্য-সমালোচক শ্রীপঙ্কজ দত্ত, শ্রীগোপাল ভৌমিক, শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ, কবি রাম বসু, অধ্যাপক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নাট্য-সমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পথের পাঁচালী'-খ্যাতা শ্রীমতী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবেদিতা দাস ও শ্যামলী চক্রবর্তী প্রভৃতি।

'নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ'-এর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর সঙ্গেই শিশিরবাবু সপ্তাহে দু-দিন মিলিত হতেন। কী ধরনের আলোচনা হত সেই বৈঠকি সভায়? শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শিশিরকুমার'-বিষয়ক সায়ক বক্তৃতা-য় জানাচ্ছেন—'পুরোনো নাটকগুলি পাঠ করতেন। পড়তেন ওঁর পুরোনো ধরনে; সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজনার নানা খুঁটিনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করতেন এবং যে-কোনো বড়ো অভিনেতার সহজাত যে ক্ষমতা, আখ্যানের ক্ষমতা, কোনো কিছুকে বর্ণনা করে সজীব করে তোলার যে ক্ষমতা—সেই ক্ষমতা স্বভাবতই আয়ত্ত ছিল শিশিরবাবুর। তাই যে-নাটক আমরা দেখিনি, যে-প্রযোজনা আমরা দেখিনি, তারও ছবি, তারও ধ্বনি আমাদের সামনে মূর্ত হত। আমরা কোথাও সেই হারানো পরম্পরাকে গ্রহণ করতে পারতাম, ছুঁতে পারতাম, আবছা দেখতে পারতাম। তার অদ্ভুত একটা সুযোগ আমাদের হয়েছিল। আমার থিয়েটার দেখার বা বোঝার সূত্রপাত বা প্রথম পদক্ষেপ এই ছোট্ট গোষ্ঠীর মধ্যে। তখনও কলেজে পড়ি। খুব পেছন দিকে বসে বসে শিশিরবাবুর কথা বা কী হত সেগুলো নোট করতাম। একটা ডায়রিতে লেখা থাকত।...'

এই হল শমীকবাবুর 'নাট্যাচার্যের সান্নিধ্যে'-ডায়রির উৎস। সুতরাং এটা অনুমান করাই যায় যে শিশিরকুমারের সঙ্গে শমীকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়েছিল ১৯৫৮-র ওই 'নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ'-এর মধ্যে দিয়েই। এই পরিষদ-এর সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন শমীক। তখন তিনি প্রেসিডেন্সির ছাত্র।

'নাট্যাচার্যের সান্নিধ্যে' ডায়রি অনুসারে শমীকের লেখা প্রথম ডায়রির তারিখ হল ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮। ওই দিনটিতে শমীক যা লিখেছেন, তা থেকে আমরা জানতে পারছি যে, দেবকুমার বসু শমীকবাবুকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ্ কর্তৃক নাট্যাচার্যের জন্মবার্ষিকীতে যোগ দেওয়ার জন্য। ২ অক্টোবর ১৯৫৮, শিশিরকুমারের শেষ জন্মদিন। নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ্ কর্তৃক আয়োজিত সেই জন্মদিনে তাঁকে মাল্যদানের সঙ্গে নানান উপহারও দেওয়া হয়। এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন থেকে ২ অক্টোবর তারিখটিকেই আমরা নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ্-এ শমীকের যোগদানের তারিখ বলতে পারি। ওই দিনে শমীকের অভিজ্ঞতার কথা শমীক তাঁর ডায়রিতে লিখেছেন ৩ অক্টোবর তারিখে। তাই ৩ অক্টোবর

তারিখে লেখা তাঁর ডায়রি শিশিরকুমারের সান্নিধ্যের প্রথম দিন। ডায়রিতে শমীক লিখেছেন 'বিদায় নেবার সময় প্রণাম করে পরিচয় দিলাম, উনি আশীর্বাদ করে বললেন, 'তোমারই সব তোমরা বড়ো হও। I am drying up'.

মোট ক'দিনের ডায়রি লিখেছিলেন শমীক? 'নাট্যচার্যের সান্নিধ্যে' ডায়রি থেকে আমরা মোট ১৭ দিনের বর্ণনা পাচ্ছি। এই তারিখগুলি যথাক্রমে ১ জুলাই ১৯৫৯, ১৯৫৮-এর ২৬ সেপ্টেম্বর, ৩ অক্টোবর, ১৭ অক্টোবর, ২৪ অক্টোবর, ১৪ নভেম্বর, ১৮ নভেম্বর, ২৪ নভেম্বর, ২৭ নভেম্বর, ১ ডিসেম্বর, ৫ ডিসেম্বর, ৮ ডিসেম্বর, ১৩ ডিসেম্বর, ১৪ ডিসেম্বর, ১৫ ডিসেম্বর, এরপর আবার ১৯৫৯-এর ১৬ মে এবং শেষ তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০।

লক্ষণীয় শমীক শুরু করেছেন নাট্যাচার্যের মৃত্যুর পরের দিনটির বর্ণনা দিয়ে। তার পরেই ১৯৫৮-তে নাট্যাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র ধরে পরপর দিনগুলির কথা। শেষ করছেন ১৯৬০-এ ৯ ফেব্রুয়ারি, এপ্রিলে প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকায় তা প্রকাশিত হচ্ছে। মোটামুটি শিশিরকুমারের জীবনের শেষ দশ মাসের কিছু-কিছু মুহূর্তকে শমীক এই ডায়রিতে ধরে রেখেছেন। এরই পরিপূরক কিছু বর্ণনা আমরা পেতে পারি শ্রীরবি মিত্র ও শ্রীদেবকুমার বসু সংকলিত *শিশির সান্নিধ্যে* গ্রন্থে।

আর-একটি তথ্য পাঠকের গোচরে থাকা দরকার, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় 'নাট্যাচার্যের সান্নিধ্যে' এই ডায়রিটি *প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকায়* প্রকাশিত হওয়ার পর এতদিন পর্যন্ত তা কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয়নি কিংবা পুনঃপ্রকাশিত হয়নি। তবে একেবারেই তা প্রকাশিত হয়নি এমনটা নয়। কেননা ২০০০ সালে সায়ক নাট্যদল আয়োজিত 'সায়ক নাট্য বক্তৃতামালা'-য় শিশিরকুমার বিষয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে শমীক তাঁর বক্তৃতার শুরুতে ওই ডায়রির প্রায় সিংহভাগ অংশই উদ্ধার করেছিলেন। সেপ্টেম্বর ২০০০, *সায়ক নাট্যপত্র*-এ ওই বক্তৃতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে তা সায়ক নাট্যপত্র প্রকাশিত শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা* গ্রন্থে (২০১১-তে) সংকলিত হয়।

অবশ্য বক্তৃতাটিতে ডায়রির 'প্রায় সিংহভাগ' উদ্ধৃত হয়েছে, কথাটা আর-একটু স্পষ্ট হওয়া দরকার। বক্তৃতায় শমীক ডায়রির প্রথম তারিখটি দিয়েছেন ৩ অক্টোবর ১৯৫৮। ওইদিন থেকে শুরু করে ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ পর্যন্ত ডায়রির মোট তেরো দিনের বর্ণনা তুলে ধরেছিলেন। সেখানে যে তারিখগুলির বর্ণনা ছিল না সেইগুলি যথাক্রমে : ১ জুলাই ১৯৫৯, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮, ৮ ডিসেম্বর ১৯৫৮ এবং ১৫ ডিসেম্বর ১৯৫৮ এই চারটি দিন।

বক্তৃতায় শুধু ওই চারটি দিনের ডায়রি তিনি বাদ দিয়েছিলেন, তাই-ই নয়, উদ্ধৃত ডায়রিগুলিকেও প্রয়োজন-মতো সম্পাদনা করে তবেই সেগুলি বক্তৃতায় ব্যবহার করেছিলেন। এক্ষেত্রে পত্রিকায় প্রকাশিত ডায়রির অনুচ্ছেদগুলিকে তিনি বক্তৃতায় আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদ হিসেবে রাখেননি, একটি দিনের ডায়রি একটিই অনুচ্ছেদ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত ডায়রির কোনো-কোনো বাক্য প্রয়োজন-মতো তিনি বাদ দিয়েছিলেন। আমি একটি মাত্র দিনের ডায়রির এরকমই দুটি বাদ পড়া অংশ পাঠকের কাছে উদাহরণ হিসেবে রাখছি, তাতে করে পাঠক শমীকের সম্পাদনার ধরন ও উদ্দেশ্যটি বুঝতে পারবেন।

উদাহরণ : ১. ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ অর্থাৎ ডায়রির শেষ দিনের লেখায় পঞ্চম অনুচ্ছেদের চতুর্থ লাইনে 'নাটকে কথা বলার কোনো বিশেষ সুর বা ভঙ্গি তিনি চর্চা করেননি' ঠিক এর পরেই প্রথম বন্ধনীর মধ্যে থাকা এই বাক্যটি তিনি বক্তৃতায় ব্যবহার করেননি—'যেমন চর্চা ক'রেছেন শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র—'রক্তকরবী', 'পুতুলখেলা', 'শুভবিবাহ'-এ তৃপ্তি মিত্রের বাচনভঙ্গী তাই কখনও বদলায় না।'

উদাহরণ : ২. ওই একই অনুচ্ছেদের শেষ থেকে তৃতীয় লাইনে 'কণ্ঠস্বরের এমন সহজ-সঞ্চরণ-ক্ষমতা আর কোনো অভিনেতার গলায় পাইনি—' এই অংশটির পর অনুচ্ছেদের বাকি বাক্যাংশ বক্তৃতায় বর্জিত হয়েছিল। বর্জিত অংশটি হল : 'শম্ভু মিত্র' মডিউলেশন'-এর চর্চা ক'রে থাকেন, সীমিত ক্ষেত্রে সফলতাও অর্জন ক'রেছেন, কিন্তু নাট্যাচার্যের কণ্ঠস্বরের দূরপ্রসারী বিচিত্রতা তাঁর গলায় নেই।'